গাদীরে খুম এর ঘোষণা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ডা: এ.এন.এম.এ মোমিন

ভূমিকা: হযরত মুহাম্মদ (দ.) ১০ই জিলহজ্ব বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করার পর গাদীরে খুম নামক স্থানে ১০ম হিজরীর ১৮ জিলহজ্ব তারিখে এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে ধারাবাহিক সনদ সমূহের ভিত্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই ভাষণের বিষয়বস্তু সর্বজন বিদিত নয় এবং বাস্তব জীবনে মুসলিম উম্মাহ এই ভাষণের মূল শিক্ষা কার্যত অস্বীকার করে জাতিগতভাবে এক মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। ইসলাম ধর্মীয় রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাদ দিয়ে একটি বিকৃত রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি করেছে যা পবিত্র কুরআনের আলোকে ভুল, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর। অর্থাৎ নবুওয়ত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যা রসূল (দ.) জীবনে একীভূত ছিল। তা আলাদা করে ধর্ম ও রাজনীতি দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। রসূল (দ.) এর গাদীরে খুম নামক স্থানে প্রদত্ত ভাষণের মূল ভিত্তি হলো আয়াতে তাবলীগ যা সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াত "ইয়া আইয়্যুহাররাসূলু বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মিররাব্বিকা ওয়া ইল্লাম তাফ'আল ফামা- বাল্লাগতা রিসালাতাহু ওয়াল্লাহু ইয়া'সিমুকা মিনান্নাস ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল ক্বাউমাল কাফেরিন।" অর্থ: "হে রসূল! পৌঁছে দিন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে, যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তার রেসালতের কোন কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" আয়াতটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই হুকুম যা প্রচার করার জন্য রসূল (দ.) কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা ভিন্ন মাত্রার এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা উম্মাহকে জানানো না হলে নবুওত ও রেসালতের সমস্ত শিক্ষা কার্যত অকার্যকর বা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার এই হুকুমটি এমনই স্পর্শকাতর যে, তা প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে গেলে মানুষের পক্ষ থেকে রসূল (দ.) এর অনিষ্টের আশংকা রয়েছে। আর সঠিকভাবে এই হুকুম বা নির্দেশনা না মানা বা প্রতিপালন না করা হলে সেই সম্প্রদায় কার্যত কাফের বা খোদা অস্বীকারকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। তাই মানবীয় বিবেক একথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য যে, এই নির্দেশনাটা কি? যে কারণে আল্লাহ্ তা'লা, এই বিষয়টিকে এত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর জানাও সেই জন্য অত্যবশ্যক বা ফরজ।

ঐতিহাসিক ও তাফসিরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীরে সামান্য শব্দগত তারতম্যসহ কেবল একটি ঘটনাকেই উল্লেখ করেছেন।

হাফিজ আবু নাঈম ইস্পাহানী স্বীয় "হিলইয়াতুল আউলিয়া" গ্রন্থে এবং সালাবী তার তাফসীর গ্রন্থে রসূল (দ.) এর সাহাবি বার'আ বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি তখন নাজিল হয়েছিল যখন রসূলে মকবুল (দ.) বিদায় হজ্ব শেষ করে মদীনার দিকে ফেরার সময় খুম নামক স্থানে পৌঁছে ছিলেন, যা মক্কা মোয়াজ্জমা এবং মদীনাতুল মোনাওয়ারার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি জলাশয়। এটি গাদীরে খুম নামে পরিচিত ছিল। কাজেই উক্ত আয়াত নাজিল হলে রসূল (দ.) খুমের পাড়ে অবস্থান করলেন এবং মিম্বরে উঠে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন যার মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন, "মান কুন্তু মাওলাহ ফা আলীয়ুন মাওলাহ" অর্থাৎ- আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা।" অনুরূপভাবে হাফেজ আবু বক্কর বিন মারদুইয়্যাহ তাঁর মানাকিব কিতাবে বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর ভাষ্য অনুযায়ী 'আমরা রেসালতের যুগে এ আয়াত **বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা** - কে ইল্লা আলীয়্যান মাওলাল

মোমিনা বাক্যসহ তেলাওয়াত করতাম। (তাফসীরে মাযহেরী, আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথি (রা.), ইসলমিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খন্ড (৫ম ও ৬ষ্ঠ পারা) সূরা মায়েদার -৬৭ নং আয়াতের তাফসীর)। অতঃপর রসূল (দ.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের বাহু স্বীয় পবিত্র হাত ধরে তাঁবু থেকে বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আলাসতু আউলা বিকুম মিন আনফুসিকুম" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের উপর নিজেদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি না? তাঁরা সকলেই বললেন, "বালা ইয়া রাসূলাল্লাহি" হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতি আমাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখেন" এই অঙ্গীকার নেয়ার পর রসূল (দ.) নিজের পবিত্র বরকতময় মুখে বল্লেন, মান কুন্তু মাওলাহু ফা আলীয়ান মাওলাহু। অর্থাৎ যে "আমাকে তাঁর নফসের অধিকারী বলে মেনে নেবে, তাঁর জন্য আবশ্যক কর্তব্য হবে, সে যেন আলীকেও তাঁর নফসের অধিকারী বলে মেনে নেয়"। অতঃপর রসূল (দ.) আল্লাহর দরবারে এই মোনাজাত করলেন, "আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাদু ওয়া আদি মান আদাহু ওয়ান সুর মান নাসারাহু ওয়াখজুল মান খাজালাহু" অর্থাৎ আমি যার মাওলা, আলীও তাঁর মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি তাকে বন্ধু গণ্য করো, যে একে (আলীকে) বন্ধু গণ্য করে এবং তাকে শত্রু গণ্য করো, যে একে (আলীকে) শত্রু গণ্য করে এবং তাকে সাহায্য করো, যে একে (আলীকে) বন্ধু করে এবং রাগান্বিত হও তার প্রতি, যে একে (আলীকে) রাগান্বিত করে।

উল্লিখিত হাদীসটি এমনই প্রসিদ্ধ ও এমন ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, সম্ভবত অন্য কোন হাদিস এত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। যে সকল প্রসিদ্ধ সাহাবি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন: হযরত আবু বক্কর সিদ্দিকী (রা.), হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.), হযায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা.), রাবি'আ বিন আযিব আনসারী (রা.), আবু যর গিফারী (রা.), যায়েদ বিন আকরাম (রা.), হযরত সালমান ফারসী (রা.), জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.), হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব (রা.), প্রমুখ। যে সকল বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক মুহাদ্দিসগণ কালামবিদগণ ও সীরাত লেখকগণ উল্লিখিত হাদিসের আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

হিলইয়াতুল আউলিয়া: আবু নাঈম, খাসায়েসে নাসায়ী, দুররে মানসুর: জালালউদ্দিন সুয়ুতী, জাখায়েরুল উকবা: আল্লামা জরীর ইবনে তাবারী, রুহুল মায়ানী, আল্লামা শাহাবুদ্দিন শাফেয়ী আলুসী, সাওয়ায়েকে মুহরিকা: ইবনে হাজার মক্কী, মুসনদে আহম্মদ: ইবনে হাম্বল, মানাকিবে খাওয়ারেজেমী: মায়ারিফে ইবনে কুতায়বা দিনওয়ারী ইত্যাদি।

যে সব ঐতিহাসিক উক্ত হাদীসকে তাদের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:- আনসাবুল আশরাফ: বালাজুরী, তারিখে তাবারী: তারাবী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল: শাহরিস্তানী, শরহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, মুকাদ্দামায়ে তারিখ: ইবনে খালদুন, উসদুল গাবাহ: ইবনে আসীর ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনের রাজনৈতিক মতবাদের সন্ধানে: বিশ্ব জাহানের প্রভু, সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক, শাসন কর্তা, তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা পৃথিবী হিসাবে যেখানে বাস করি সেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে জানার, চিন্তা করার, বুঝবার শক্তি দিয়েছেন, ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাচাই-বাছাই করার ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। অর্থাৎ এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন দান করে তাকে পৃথিবীতে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে: "স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (আমার পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম

পরিচালিত) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল, আপনি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুন-খারাবি করবে? আল্লাহ্ জবাবে বললেন, "আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।" আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন (অর্থাৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন)। এরপর এক এক করে সবকিছু ফেরেশতাদের সামনে হাজির করে বললেন, তোমরা এগুলোর নাম, (বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ) আমাকে বলে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। (সূরা বাকারা- ৩০-৩২)।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম শিক্ষা হলো- মানবীয় চরিত্রের এমন একটি দিক রয়েছে যা স্বভাবতই অন্য মানুষের সাথে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ এবং খুন-খারাবি করার প্রবণতা। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ তথা পরিহার করার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত যে দিক নির্দেশনা বা জীবন বিধান রয়েছে তা মানব জাতির জন্য অবশ্য পালনীয়। আর এই দিক-নির্দেশনা হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত 'হেদায়েত'-দ্বীন-ধর্ম আর এই দ্বীনই হলো ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্য। যা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হতে হবে এবং তা আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত বা নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালনা বা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়টি পরবর্তীতে কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "আমি বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। তারপর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই সত্য পথের দিক-নির্দেশনা জীবন ব্যবস্থা (আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে) প্রেরণ করব। তখন যারা এই দিক-নির্দেশনা অর্থাৎ নৈতিক বিধি-বিধান (সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা) অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় বা দুঃখ থাকবে না। আর যারা সত্য পথের নৈতিক বিধানকে প্রত্যাখান করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।" (সূরা বাকারা- ৩৭) অর্থাৎ আল্লাহর এই বিধি-বিধান প্রেরণ তার ব্যাখ্যা, প্রতিপালন ও তা সর্বযুগে বাস্তবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশ্ববাসী কখনো যেন কোনক্রমেই আল্লাহর এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না হয়। এই দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল যুগে মানবজাতির হেদায়েত লাভের মাত্র দুইটি উপায় রয়েছে। এক আল্লাহর কালাম, দুই নবী-রসূলগণের ব্যক্তিত্ব। নবী-রসূলগণকে আল্লাহতালা শুধু তার বাণী পৌঁছে দেয়ার এবং তা শিক্ষা ও উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবেই পাঠাননি। বরং সেই লক্ষ্যে তাঁদেরকে বাস্তব নেতৃত্ব দান ও পথ প্রদর্শনের নির্দেশ ও দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহর বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে মানুষ ও সমাজ সংস্কার তথা সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করে একটি সৎ ও সুষ্ঠু সমাজ পুনর্গঠিত করে দেখান।

এ দুটি বিষয় চিরকাল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে, না মানুষ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, আর না সে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিকে আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ থেকে আলাদা করলে তা এক কাণ্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন অনভিজ্ঞ জীবন পথের যাত্রী তা নিয়ে জীবন সমুদ্রে যতই ঘুরাফিরা করুন না কেন সে কোন দিনই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে না। আবার আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা করা হলে মানুষ সঠিক পথ পাওয়ার পরিবর্তে এক মহাবিভ্রান্তির শিকার হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (দ.) বলেছেন, আমার আহলে বাইয়াত ও কুরআন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাউজে কাউসারে পৌঁছানো না পর্যন্ত তা আলাদা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহর এ হিদায়েত সর্ব যুগে বর্তমান থাকবে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়টি গুরুত্বহীন বিবেচনা করায় তারা আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নবী-রাসুলদের বৈশিষ্ট্য: পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে পারদর্শী লোকেরা যেমন একটি বিশেষ মন-মস্তিষ্ক ও বিশেষ ধরনের প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, অনুরূপভাবে নবী-রসূল বা আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ একটি বিশেষ প্রকৃতি ও যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

আমরা একজন স্বাভাব কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পীর প্রতিভা দেখে ও শুনে বুঝতে পারি যে, তিনি বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাই আমরা স্বভাব বাগ্মী, জন্মগত লেখক, বৈজ্ঞানিক ও জন্মগত নেতাকে তাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সহজেই চিনতে পারি। নবী-রাসূল বা আল্লাহর নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। তারা এমন এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ বা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন সব সূক্ষ্ম কথার গভীরে প্রবেশ করে যেখানে বছরের পর বছর গবেষণা করার পরও অন্যদের দৃষ্টি পৌঁছায়না। তিনি যা কিছু বলেন, আমাদের বুদ্ধি তা গ্রহণ করে নেয় এবং আমাদের মন তার সাক্ষ্য প্রদান করে। দুনিয়ার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সৃষ্টি জগতের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে তার প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়। উপরন্তু তার প্রকৃতি এতই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় যার ফলে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি বা তারা সত্যনিষ্ঠ ও ভদ্রোজনোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কখনো ভুল কথা বলেন না। কোন খারাপ কাজ করেন না। সব সময় সুকৃতি ও সত্য নিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে যান। অন্যকে যা বলেন, নিজে তার উপর অনুশীলন করেন। তিনি নিজে যা বলেন কাজের সময় তার বিরুদ্ধাচারণ করেন এমনটি তাঁদের জীবনে কোনদিন দেখা যায়নি। তাঁর কথায় ও কাজে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকেনা। অন্যের ভালোর জন্য তিনি নিজের ক্ষতি করেন এবং নিজের ভালোর জন্য অন্যের ক্ষতি করেন না। তাদের সমগ্র জীবন গঠিত হয় সভ্যতা, ভদ্রতা, মানসিক পবিত্রতা, উন্নত চিন্তা ও উচ্চ পর্যায়ের মানবতার আদর্শে। সর্বোপরি তাঁর অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা বা শক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্ব স্রষ্টার নির্বাচিত ব্যক্তি অর্থাৎ নবী-রাসূল বা অনুরূপ। এ সব নির্বাচিত ব্যক্তিদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা: ১. এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে স্থির বিশ্বাসীদের একজন হয়। (আনয়াম-৭৪) ২. হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা: আর তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কিতাব হিকমত ও তওরাত ও ইঞ্জিল। তাকে রাসুল করেছেন বনি ইসরাইলদের জন্য। আমি তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে একটি পাখি বানাব তার পর আমি ওতে ফুঁ দেব। তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করব। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমাদের বলে দিব তোমরা কী খেয়েছ আর কী মজুদ রেখেছ। (সূরা আলে ইমরান-৪৯) ৩. হযরত মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, "শপথ অস্তমিত নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্ট নয়, আর সে নিজের ইচ্ছা মত কথা বলে না। এ অহী (প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ) যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দেয় মহা শক্তিধর। (সূরা নজম- ২-৪) ৪. আল্লাহর ওলী সম্পর্কে কুরআন, জানিয়া রাখ আল্লাহর বন্ধুদের (ওলী) কোন ভয় নাই, তাঁরা দুঃখিত হইবে না। (সূরা ইউনুস -৬২) যাহারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই মহাসাফল্য।

নবী-রাসূল নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়োগ: আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশ্ব পরিচালনার জন্য তার প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে: ১. স্মরণ করো, যখন তার পালনকর্তা (রব) কয়েকটি বাক্য (বিষয়ে) দিয়ে ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করলেন, এবং সে সেইগুলি পূর্ণ করলেন, আল্লাহ বললেন আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম (নেতা যাকে অনুসরণ করা হয়, অনুকরণীয়)

নির্বাচন/ নিয়োগ করলাম। সে (ইবরাহীম) বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও! আল্লাহ বলেন হ্যাঁ কিন্তু আমার অঙ্গীকার (এই নির্বাচন নিয়োগ প্রক্রিয়া) জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা-১২৪)

২. হে দাউদ আমি আপনাকে পৃথিবীতে আমার খলীফা নিয়োগ করলাম। (সূরা সাদ-২৬)

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (নেতৃত্ব/মালিকানা, উত্তরাধিকারিত্ব) দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। (সূরা নূর-৫৫)

৪. এবং আমরা যাবুর কিতাবের উপদেশ নসীহতের পর লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী (মালিক, ওয়ারিস/নেতা) হবে আমার নেক ও সৎ কর্মশীল বান্দাগণ। (সূরা আম্বিয়া- ১০৫)

৫. হে ঈমানদারগণ আল্লাহর আনুগত্য কর, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এবং তাদের যাদেরকে রাসূলের ন্যায় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (সূরা নিসা-৫৯)।

৬. আল্লাহ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক (ওলীয়া মুর্শিদ) পাইবেনা। (সূরা কাহাফ -১৭)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, নবী-রাসূল, ইমাম, খলীফা, ওয়ালী, মুর্শীদ, উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) ক্ষমতা প্রদত্ত (উলিল আমর) ইত্যাদি যে সব পদবী ব্যবহার করা হয়েছে, এ সব পদবীর নিয়োগকর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীর মহান প্রশাসক হিসাবে তাঁর নিয়োগকৃত এইসব প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন। এটি আল্লাহর একটি স্থায়ী বিধান।

নবী রাসূল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলওয়াত করে তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আলে ইমরান- ১৬৪) পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানব জাতি আল্লাহর এই সব প্রতিনিধিদের সর্বোত্তম মানবীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব সহজভাবে মেনে নেয়নি। বরং এই সব ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে বা তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে নিজেরাই নিজেদের নেতা নিয়োগ করে মানব জাতির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এ ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা "যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে (বাণী নিয়ে) যা তাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী ও কতককে তারা হত্যা করে। (সূরা মায়েদা -৭০)

আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিকে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় ঞযবড়পৎধপু বা ঈশ্বরতন্ত্র, ঐশীতন্ত্র বা দিব্যতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতায়ই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মূল ব্যক্তিকে হত্যা বা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার পর অবৈধ ক্ষমতা দখলদারগণ আল্লাহর নামে বিভিন্ন মিথ্যা আরোপ করে দুনিয়ার সকল পার্থিব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এবং মানব জাতির জন্য মূর্তিমান বিভীষিকা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছে মর্মে দেখা যায়, যেমন ইউরোপে পোপতন্ত্র ও হোলি রোমান এম্পায়ের (ঐড়ষু জড়সধহ ঊসঢ়রৎব) ওহয়ঁরংরঃরড়হ এর মাধ্যমে ইউরোপীয় জনগণের উপর ধর্মের নামে যে অমানুষিক নির্যাতন করেছে তা সর্বজন বিদিত। অনুরূপভাবে উমাইয়া শাসকগণ রাসূল (দ.)এর সাহাবী ও মহান আহলে বায়াতদের উপর হত্যা, নির্যাতন এর যে স্টিমরোলার চালিয়েছে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আবার আব্বাসীয় শাসকগণ শরীয়ত রক্ষার নামে আল্লাহর ওলীদের উপর যে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করেছে তাও আমরা

ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত রূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে'। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে, কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন করনা?" (সূরা আরাফ-১৬৯)।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা গাদীরে খুমের মূল শিক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

১. আল্লাহ তায়ালা এক এবং একক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও রসুল (দ.) তাঁর বৈধ প্রতিনিধি তাই সকল প্রকার আনুগত্য, মান্যতা ভয়, ভীতি পুরস্কার ও তিরস্কারের মালিক একমাত্র তিনি।

২. আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং মানব জাতির জন্য নেতা মনোনীত করেন তাই মানুষ নিজে থেকে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (দ.) এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হলেন আলী ইবনে আবি তালেব, হযরত হাসান (রা.) হযরত হোসেন (রা.) ও তাঁদের পবিত্র বংশধরগণ।

৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করার জন্য আহলে বায়াতগণ হলেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

৪. আল্লাহর মনোনীত পছন্দনীয় ও নির্বাচিত দ্বীন (মতবাদ, চিন্তাধারা, দর্শন, জীবন ব্যবস্থা) হলো আল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর নিকট প্রকৃত আত্মসমর্পণ। অন্য কোন জীবন দর্শন মতবাদ তথা নাস্তিকতাবাদ, ডারউইনবাদ, সমাজতন্ত্র, তথা কথিত মানবতাবাদ, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, উদারতাবাদসহ সকল মানব সৃষ্ট দর্শন বা মতবাদ অথবা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের মাধ্যমে বেহেশত, দোজখের অস্বীকৃতি ইত্যাদি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৫. মানবজাতি পার্থিব ও অপার্থিব যে কোন ধরনের সমস্যায় পতিত হোক না কেন সে যেন সব সময় বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মহান ব্যক্তিবর্গকে যথা ইমাম, ওলী, মুর্শিদ অনুসন্ধান করে।

৬. বিশ্ব পরিচালনায় ইমাম, ওয়ালী, মুর্শিদ, উলিল আমরদের তথা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির উপস্থিতি একটি প্রশাসনিক অপরিহার্যতা। এই বিষয়টি কার্যত অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার কারণে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দ.) যা হালাল ও হারাম ঘোষণা করেছেন কোন বৈজ্ঞানিক, কোন চিকিৎসক, কোন দার্শনিক, কোন অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী তা রদ করতে পারবেনা।

৮. আল্লাহ, রাসূল (দ.) ও আহলে বায়াতের দুশমন বা ঘৃণা পোষণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ।

৯. সর্ব অবস্থায় পরহেজগারী তথা আল্লাহ সচেতন হতে হবে।

১০. কিয়ামতের ভয় করতে হবে যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, ঐ সময়কার ভূমিকম্প খুবই কঠিন বিষয়।

১১. সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে হিসাবের কথা স্মরণ করতে হবে।

১২. আল্লাহর দরবারে পরীক্ষা আর জিজ্ঞাসাবাদকে স্মরণে রাখতে হবে।

১৩. সদাসর্বদা সওয়াব ও আযাবের স্মরণ রাখতে হবে।

১৪. স্মরণ রাখতে হবে যে ইমামবিহীন অবস্থায় সমাজে আমর বিল মারুফ (সৎ কাজে আদেশ) নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজে নিষেধ বাস্তাবায়ন সম্ভব নয়। তাই ইমামতের তথা সঠিক নেতৃত্বের বিষয়টি সমাজের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১৫. ইমাম মাহদী (আ.) রাসূল (দ.) ও আলী (রা.) এর রক্তধারা থেকে আসবেন। তিনি সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয় লাভ করবেন। তিনি জালিমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আল্লাহর বন্ধুদের সর্ব প্রকার অবৈধ রক্তপাতের প্রতিশোধ তিনিই গ্রহণ করবেন। তিনি সমস্ত ফজিলত প্রাপ্তদের ফজিলত এবং সমস্ত মূর্খের মূর্খতার পরিচয় তুলে ধরবেন। তিনি সমস্ত জ্ঞানের উত্তরাধিকারী আর উক্ত জ্ঞানের প্রতি তার পূর্ণাঙ্গ দখল থাকবে। তিনি হবেন স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে সংবাদ দাতা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় কথা প্রচারকারী। তিনি হবেন সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী, আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। সকল ব্যাপার তার নিকট হস্তান্তরিত হবে। পূর্বের নবী-রাসূলগণ তাঁর (ইমাম মাহদীর) শুভ সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর দলিল রূপে তিনিই বেঁচে থাকবেন। সত্য কেবল তাঁর সঙ্গেই থাকবে। আর নূর কেবল তার কাছেই থাকবে। কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবেনা। এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারবেনা। তিনি হবেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ওয়ালী (মনোনীত প্রতিনিধি) আর আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তার নিযুক্ত হাকিম (শাসক) এবং জাহের ও বাতেনের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে আমানত রক্ষাকারী ও সত্যবাদী।

উপসংহার: বর্তমান মুসলমানদের ইতিহাস থেকে গাদীরে খুমের ইতিহাস ও শিক্ষাকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হচ্ছে বিধায় মুসলিম উম্মাহ এক মহা ক্ষতির মধ্যে বিরাজ করছে। তাই গাদীরে খুমের প্রকৃত শিক্ষা জানা ও মানার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের এই শিক্ষার তাৎপর্য ও গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা পালনের তৌফিক দিন। কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা দ্বীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা রয়েছে মর্মে স্বয়ং ঘোষণা করেছেন।